আহমদ ছফা:
ব্যক্তি ও
ব্যক্তির তাৎপর্য
পাক্ষিক চিন্তার
আহমদ ছফা সংখ্যা
২৭

কলকাতা বই মেলা '৯৯ সংখ্যার জন্য কলকাতার স্বাধীন বাংলা সাময়িকীর জন্য আহমদ ছফার একটি গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষাৎকার

কলকাতা বইমেলা '৯৯ সংখ্যার জন্য কলকাতার স্বাধীন বাংলা সাময়িকীর পক্ষে আহমদ ছফার এই সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করা হয়েছিল। এই সাক্ষাৎকারটি বাংলাবাজার পত্রিকা তাদের পাঠক-পাঠিকাদের জন্য সেখান থেকে নিয়ে তিন কিস্তিতে (১৮ মাঘ ১৪০৫/ ৩১ জানুয়ারি ১৯৯৯, ১৯ মাঘ ১৪০৫/১ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯, ২০ মাঘ ১৪০৫/২ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯) আবার ছাপে।

প্রশ্ন : ১৯৪৭-এর পর পূর্ব পাকিস্তান এবং ১৯৭১-এর বাংলাদেশ এই পর্ব দুটি আপনার চিন্তার জগতকে কিভাবে প্রভাবিত করেছে?

আহমদ ছফা: পাকিস্তান যখন হয় তখন আমি শিশু। পরবর্তী সময়েও পাকিস্তান আমার মনের ওপর কোন প্রভাব ফেলতে পারে নি। বাহান্নর একুশে ফেব্রুয়ারিতে আমি ক্লাস থ্রি বা ফোরের ছাত্র ছিলাম। সে সময় বাংলা ভাষার দাবিতে আমিও মিছিলে গেছি এবং আমার এক ভাই একুশে ফেব্রুয়ারির আন্দোলনে মুসলিম লিগারদের হাতে মার খায়। তার থেকেই পাকিস্তানের কোনও প্রভাব আমার মনে কখনো কাজ করে নি। বরং আমার আকর্ষণ ছিল কোলকাতার প্রতি। ওখানকার পত্রপত্রিকা ও সাহিত্যের প্রতি আমার ছিল প্রবল টান। 'নবজাতক' নামে মৈত্রেয়ী দেবী কোলকাতা থেকে একটা পত্রিকা বের করতেন। ১৯৬৫ সালে সেই পত্রিকা আমার কাছে তিনি পাঠাতেন, আমি পত্রিকা বিক্রি করে তাকে টাকাটা পাঠিয়ে দিতাম। পূর্ব বাংলায় আমাদের বাঙালি অবস্থানটা শক্ত করার প্রয়োজনেই সেই সময় আমরা কোলকাতার দিকে অনুপ্রেরণার জন্যে তাকাতাম। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রাম এবং স্বাধীনতার পর, অন্য আর একটা অনুভব আমার মধ্যে এল, তা হচ্ছে–ভবিষ্যতে হয়তো কোলকাতার দিকে আর আমরা তাকাতে পারব না। কিংবা কোলকাতার প্রতি আমাদের আকর্ষণের প্রেরণাটাও আর হয়তো থাকবে না। কারণ কোলকাতা আমাদের অতীতের প্রেরণা এবং অতীত ঐতিহ্যের উৎস হতে পারে, কিন্তু একাত্তরে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর একটি স্বাধীন দেশের নাগরিক হিশেবে কোলকাতা আর আমাদের কিছু দিতে পারবে না এবং আমাদের কক্ষপথ আমাদেরই আবিষ্কার করে নিতে হবে। সেই কক্ষপথ অনুসন্ধানের জন্যে, আমরা সমস্ত কাজকর্ম ও চিন্তা নিয়োগ করেছি। শুধু আমরা নয়, বাংলাদেশের একটা অংশের মানুষের মধ্যে এ চিন্তাটা এসেছে যে, বাংলাদেশকে তার নিজের মেরুদণ্ডের ওপর দাঁড়াতে হবে, নিজেকে আবিষ্কার করতে হবে।

প্রশ্ন: বাঙালি মুসলমান মানসে পাকিস্তান আন্দোলন কোন প্রক্রিয়া সে সময় সৃষ্টি করেছিল, যার জন্যে তারা পাকিস্তান চেয়েছিলেন?

আহমদ ছফা: এটা খুব জটিল বিষয়। আমার খুব আশঙ্কা হয় সে কারণটা এখনো যায়নি। মুসলিম লীগ এখানেই হয়েছিল। মুসলিম লীগের ভিত্তি এবং শক্তি ছিল বাংলাতেই। ইতিহাসের পাতা উল্টালে আপনি লক্ষ্য করবেন যে, বাংলার অ্যাসেমব্লির মুসলমান সদস্যরা বাংলা ভাগ চান নি এবং তারা স্বাধীন বাংলার পক্ষে মত দিয়েছিলেন। বাংলার অ্যাসেমব্লির যে সব সদস্য বাংলা ভাগের পক্ষে মত দিয়েছিলেন, তাদের চার ভাগের তিন ভাগ ছিলেন হিন্দু এবং শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি ক্রমাগত এটাই বললেন যে ভারতকে এক রাখ কিন্তু বাংলাকে ভাগ করে দাও। হ্যাঁ, বাংলার মুসলমান জনগণ পাকিস্তান চেয়েছিল। কিন্তু সূক্ষ্মভাবে দেখলে বাংলা ভাগ জিন্নাহও চান নি। অনেক সময় বাংলা ভাগের জন্যে বাংলার মুসলমানদের দায়ী করা হয়, এটা সঠিক নয়।

প্রশ্ন : এই পরিপ্রেক্ষিতে আপনি কি বাংলার হিন্দুদেরই বাংলা ভাগের জন্য দায়ী করবেন?

আহমদ ছফা: অচিন্ত বিশ্বাস, 'তপসীলি রাজনীতি' শীর্ষক একটি লেখায় বলেছেন, তিন থেকে ছ'ভাগ লোকের

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রাম এবং স্বাধীনতার পর, অন্য আর একটা অনুভব আমার মধ্যে এল, তা হচ্ছে– কোলকাতার প্রতি আমাদের আকর্ষণের প্রেরণাটাও আর হয়তো থাকবে না।

(বর্ণহিন্দু) স্বার্থে বাংলা ভাগ হয়েছে। বক্তব্যটা অমূলক নয়। জয়া চ্যাটার্জি 'Bengal Divided Hindu Comunalism and Partition' বইতে এসব তুলে ধরেছে।

প্রশ্ন: '৪৭-এ স্বাধীন সার্বভৌম বাংলা গঠনে আবুল হাশিম এবং শরৎ বসুদের প্রচেষ্টা সফল না হবার কারণও কি ওই তিন থেকে ছ বর্ণহিন্দুর স্বার্থ?

আহমদ ছফা: না; না, ওটাই একমাত্র কারণ নয়। ওই একটি কারণেই ওই রকম একটা বিরাট ঘটনা ঘটে নি। প্রথম প্রভাব প্রতিপত্তির দিক দিয়ে ১৯৩০-এর পর বাংলা ভাষা চতুর্থ ভাষা হয়ে গেল কোলকাতায়। প্রথম ভাষা ইংরেজি, দ্বিতীয় ভাষা হিন্দি, তৃতীয় ভাষা উর্দু। তারপর মহাযুদ্ধ, ওই যুদ্ধ বাঙালির অর্থনীতিকে সম্পূর্ণ ভেঙ্গে দিল এবং বাঙালির রাজনীতি সম্পূর্ণভাবে নির্ভর হয়ে গেল পশ্চিমী অবাঙালিদের টাকার ওপর। বাংলা ভাগের জন্যে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জিদের অর্থটা দিয়ে ছিল টাটা। যে কারণে সুভাষ বোসকে কংগ্রেস ছাড়তে হল, এমনকি শেষ পর্যন্ত দেশও ছাড়তে হল। গান্ধী এবং নেহরুকে টাকা দিত মাড়ওয়ারি এবং গুজরাটিরা। একজন বাঙালি সভাপতিকে তারা টাকা দিতে রাজি ছিল না এবং গান্ধী-নেহরু কখনই চান নি সুভাষ বসুর মত একজন বাঙালি কংগ্রেস দলের সভাপতি হোন বা থাকুন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ না হলে এবং বাঙালির অর্থনীতিটা ভেঙ্গে না গেলে হয়তো বাঙালির এই পরিণামটা হত না।

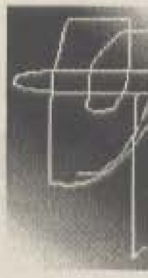

প্রশ্ন: বাংলাদেশের কিছু মানুষ মনে করেন যে পাকিস্তান হয়েছিল বলেই, পূর্ব বাংলার মানুষ বাংলাদেশ পেয়েছে। আপনিও কি এ মতের অনুসারী?

আহমদ ছফা: এর মধ্যে সত্যতা আছে, কিন্তু সম্পূর্ণ সত্য নয়। ইতিহাসের আরও পেছনে যাওয়া দরকার। যেমন পশ্চিম বাংলার অর্থনীতিবিদ ও চিন্তাশীল লেখক ড. অশোক মিত্র বলেছেন, ১৯০৫ সলের বঙ্গভঙ্গ রদ না হলে, অর্থাৎ তখন যদি বঙ্গ বিভাগ হত তবে বাঙালি মুসলমান মধ্যবিত্তের বিকাশ ঘটতো এবং বিকশিত বাঙালি মুসলমান মধ্যবিত্ত বাঙালি হিন্দুদের সাথে একটা সমঝোতা করে নিত। ফলে ১৯৪৭-এর দেশ ভাগের কোনও প্রয়োজন ঘটতো না। বাংলাভাগ না হলে ভারত ভাগও হত না। কারণ বাংলার বাইরে পাকিস্তানের অস্তিত্ব কোথাও ছিল না। মুসলিম লীগ এখানেই হয়ে এবং এখানেই ছিল পাকিস্তানের পক্ষে মুসলিম লীগের জনভিত্তি। এছাড়া চিত্তরঞ্জন দাসের 'বেঙ্গল প্যাক্ট' যদি কার্যকর হত, তাহলেও বাংলা ভাগ হত না। তারপর ধরুন ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যান, যাতে বাংলা আসামকে একটা জোন করা হবে বলা হয়েছিল। এটা মেনে নেয়া হলেও বাংলা ভাগ হত না। অর্থাৎ কিছু ঐতিহাসিক অনিবার্যতা দীর্ঘকাল ধরে যা হয়ে আসছিল তার চূড়ান্ত অভিঘাতে বাংলা ভাগ হয়েছে।

প্রশ্ন: পাকিস্তান ভাঙ্গার পেছনে কোন ঐতিহাসিক অনিবার্যতা কাজ করেছিল?

আহমদ ছফা: বাঙালি মুসলমানের জাতীয়তাবোধ। কিন্তু শূন্য থেকে তো জাতীয়তাবোধ জন্মায় না। এখানে (পূর্ব বাংলা) যে মধ্যবিত্ত শ্রেণী গড়ে উঠল তারাই প্রথম অনুভব করল রাজনীতি, অর্থনীতি, ভাষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তানি আধিপত্য প্রতিরোধ করতে না পারলে, বাঙালি হিশেবে তাদের বিকাশ সম্ভব নয়। মওলানা ভাসানী, সোহরাওয়ার্দী, শেখ মুজিব এরা ছিলেন পাকিস্তান আন্দোলনের নেতা। পরে পাকিস্তানকেও ভাঙতে হল, কারণ ভাগে মিলছিল না। এটা একটা হিশাব, আর একটা হিশাব আছে। অর্থাৎ একটা জাতি কোন উপলক্ষে জেগে ওঠে, কত গভীরে তার প্রভাব পড়ে, অতি তুচ্ছ কারণেও কোনও ঘটনা ঘটতে পারে– কিন্তু তার প্রভাব অনেক সময় দীর্ঘস্থায়ী হয়। সেই দিক থেকে বাঙালি জাতির ইতিহাসে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের চেয়ে প্রভাব সঞ্চারী বড় কোন ঘটনা নেই।

বাংলা ভাগ না হলে ভারত ভাগও হত না। কারণ বাংলার বাইরে পাকিস্তানের অস্তিত্ব কোথাও ছিল না।

প্রশ্ন: পূর্ব বাংলার বাঙালি মুসলমানের আত্মপরিচয়ের শিকড় অনুসন্ধানে এবং জাতি পরিচয় জেগে ওঠার পেছনে বাংলা ভাষার প্রশ্ন প্রভাব কতটা ছিল?

আহমদ ছফা: ভাষাভিত্তিক জাতি পরিচয়ে ভাষাই প্রধান। ভাষা হল অধিকার উচ্চারণ করার প্রথম মাধ্যম। এই ভাষার সাথে অর্থনৈতিক বিষয়টাও যুক্ত ছিল যে নিউ মিডল ক্লাস তৈরি হচ্ছিল, তারা চাকরি-বাকরি পেত না যদি বাংলা রাষ্ট্রভাষা না হত। পূর্ব বাংলার মানুষ তখন তাদের অধিকার এবং অংশ চাইছিল। পূর্ব বাংলাকে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিশেবে তখন চাওয়া হয় নি। বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি করা হয়েছিল। বাংলা রাষ্ট্রভাষা হবার পর অন্য ইস্যুগুলো এলো, বৈষম্যগুলো পূর্ব বাংলার মানুষের কাছে স্পষ্ট হতে থাকল। ওই বৈষম্যের বিরুদ্ধে ক্ষোভ দানা বাঁধতে থাকল চাকরিতে বৈষম্য, সামরিক বাহিনীতে বৈষম্য, অর্থনৈতিক উন্নয়নে বৈষম্য ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তানের সাথে পূর্ব বাংলার বৈষম্য ছিল। এই বৈষম্যগুলোকেই রাজনৈতিক বিষয় হিশেবে পূর্ব বাংলার মানুষের সামনে তুলে ধরা হল এবং তাতে মানুষ ব্যাপকভাবে সাড়া দিলেন এবং শেষ পর্যায়ে অস্ত্র তুলে ধরলেন পূর্ব বাংলাকে স্বাধীন করার জন্যে। তবে পূর্ব বাংলার প্রতি নানা বৈষম্যের প্রতিবাদে যারা পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক সংগ্রাম-আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছেন এক সময় এরা ছিলেন পাকিস্তান আন্দোলনের নেতা।

প্রশ্ন: এখানে কি আপনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে ইঙ্গিত করছেন?

আহমদ ছফা: তা বলতে পারেন। মুসলিম লীগের রাজনীতিতে শেখ মুজিব ছিলেন সোহরাওয়ার্দীর শিষ্য এবং গুরু শিষ্য দু'জনেই ছিলেন পাকিস্তান আন্দোলনের নেতা। বাংলাদেশ যারা স্বাধীন করেছেন এক সময় তাদের বেশির ভাগই ছিলেন মুসলিম লীগে। মুসলিম লীগের Extention or junior partner ।

প্রশ্ন: বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রশ্নে এবং মুক্তিযুদ্ধে এখানকার বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বামপন্থী, বুর্জোয়া এবং চরম দক্ষিণপন্থী জামায়াত শিবিরের দৃষ্টিভঙ্গি এবং রাজনৈতিক অবস্থান?

আহমদ ছফা: শেখ মুজিবের প্রতি প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী এবং রাজনীতিবিদদের একটা সন্দেহ ছিল। শেখ মুজিব গোড়া থেকে ছিলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ঘেঁষা এবং আমি আগেই বলেছি, তাঁর রাজনৈতিক গুরু ছিলেন সোহরাওয়ার্দী। তিনি ছিলেন পশ্চিমা ব্লকের লোক। এই পরিস্থিতিতে পূর্ব বাংলার রাজনীতিতে এখানকার বামপন্থী দলগুলো যে বিরাট ভুল করেছে তা প্রায় আত্মহননের শামিল। একটা সময় বামপন্থীরাই ছিলেন পূর্ব বাংলার প্রধান রাজনৈতিক শক্তি। ১৯৬৫ সালের পূর্বে অবিভক্ত ন্যাপ বা ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টিই ছিল পূর্ব বাংলার প্রধান রাজনৈতিক শক্তি। ন্যাপের সাথে ছিল কমিউনিস্ট পার্টি, ছাত্র ইউনিয়ন সাংস্কৃতিক সংঘ, মহিলা পরিষদ শ্রমিক সংগঠন, কৃষক সমিতি। সব মিলিয়ে একটা বিরাট শক্তি। সে সময়টা ছিল বামপন্থী রাজনীতির স্বর্ণযুগ। বাংলাদেশের বামপন্থী রাজনীতির বর্তমান দৈন্যদশা দেখে পূর্বের অবস্থা কল্পনা করতে পারবেন না। চীন না সোভিয়েত কে সাচ্চা, এই প্রশ্নে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যায় আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলন। যার আঘাত নেমে আসে পূর্ব বাংলার বাম রাজনীতিতে। দু'টুকরো হয়ে যায় ন্যাপ। ১৯৬৬ সালে শেখ মুজিব যখন বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রশ্নটি সামনে এনে ছ'দফা ঘোষণা করেন তখন পূর্ব বাংলার বামপন্থীরা মস্কো এবং পিকিং শিবিরে ভাগ হয়ে পারস্পরিক বাদ–বিসংবাদে মত্ত। এবং দুই শিবির থেকেই ছ'দফার নিন্দা এবং বিরোধিতা করা হয়। অথচ ১৯৫৪ সালে ন্যাপ নেতা অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ 'হোয়াট ইজ অটোনমি' পুস্তকটি লিখে পূর্ব বাংলার জাতিসত্তার বিষয়টি তুলে ধরেছিলেন। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কমিউনিস্ট আন্দোলন বিভক্ত হবার পর পূর্ব বাংলার বামপন্থীদের কাছে আন্তর্জাতিক ভাবনাই একমাত্র গুরুত্ব পেল।

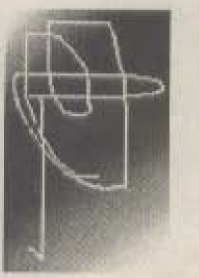

১৯৬৫ সালের পাক–ভারত যুদ্ধে রাশিয়ার মধ্যস্থতার পর মস্কোপন্থী কমিউনিস্ট পার্টি বলল, আমরা অখণ্ড পাকিস্তানে বিপ্লব করব। অন্যদিকে পাক প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান পিকিং–এর সাথে ভাল সম্পর্ক তৈরি করেছে। সেই সম্পর্কের ভিত্তিতে মাওসেতুং ভাসানীকে বললেন, ডন্ট ডিসটার্ব আইয়ুব, সে (আইয়ুব) সমাজতন্ত্রকে সমর্থন করবে। ফলে সে সময় চীনপন্থীদের মধ্যে পাক প্রেসিডেন্ট আইয়ুব বিরোধিতা না করার মানসিকতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং মুজিবের ছ'দফার মধ্যে তারা (চীনপন্থী কমিউনিস্ট) সিআইএ–এর গন্ধ আবিষ্কার করলেন। অন্যদিকে ছ'দফার সমর্থনে শহর, বন্দর, গ্রাম, গঞ্জ সর্বত্র প্রবল গণজোয়ারের সৃষ্টি হল। সে সময় পূর্ব বাংলার যে একটা মধ্যবিত্ত শ্রেণী তৈরি হয়েছে, বাঙালির একটা জাতীয়তাবাদী আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি হয়েছে, সংগ্রামের একটা স্তরে সে উন্নীত হয়েছে– মস্কো বা পিকিং এই দুই পন্থীরাই তা শনাক্ত করতে পারে নি। বাঙালির জাতিগত আকাঙ্ক্ষার রাজনৈতিক উন্মেষকালে এরা সঠিক কোন অবস্থান নিতে পারেন নি। ছ'দফার প্রতি মানুষের সমর্থন এবং বাঙালি জাতীয়তাবাদের অপ্রতিহত জয়যাত্রা দেখে মস্কোপন্থীরা ছ'দফার প্রতি সমর্থন জানাতে গেলে, শেখ সাহেব এক বাক্যে তাদের জানিয়ে দেন—দলের সাইনবোর্ড পাল্টে আওয়ামী লীগে যোগ দিন।

এছাড়া চারু মজুমদারের শ্রেণীশত্রু খতমের রাজনীতি চীনপন্থী কমিউনিস্টদের প্রবলভাবে প্রভাবিত করে। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হবার পর আমি পশ্চিম বাংলায় ছিলাম। সে সময় পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন জায়গায় দেওয়ালে দেখেছি সিপিআই (এম–এল)–এর পক্ষে শেখ মুজিব এবং মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে নানা রাজনৈতিক শ্লোগান লেখা রয়েছে। এক সময় আবদুল হক এবং মোহাম্মদ তোয়াহা ভাসানীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সারা বাংলাদেশে হত্যা, অগ্নিসংযোগ, লুট, ধর্ষণ ইত্যাদি নির্বিচারে চালাচ্ছে, আবদুল হক সাহেব তখন অখণ্ড পাকিস্তানের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করেন। মোহাম্মদ তোয়াহা এবং সুখেন্দু দস্তিদার আবদুল হকের বিরোধিতা করে দেশের অভ্যন্তরে প্রতিরোধ যুদ্ধে অংশ নেন। ভাষা আন্দোলনের নেতা আবদুল মতিন, আলাউদ্দিন, অধ্যাপক অহিদুর রহমান–রা উত্তরবঙ্গের আত্রাই অঞ্চলে মুক্তিযুদ্ধে সশস্ত্র নেতৃত্ব দেন। চীনপন্থী সিরাজ শিকদার স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক পূর্ববাংলা কায়েম করার লক্ষ্যে একাধিক সশস্ত্র সংগ্রামের নেতৃত্ব দেন। তিনি (সিরাজ শিকদার) পাকিস্তান এবং ভারত—এই দুই থাবা থেকেই পূর্ব বাংলাকে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন।

বামপন্থীদের সংগ্রাম থেকেই বাঙালি জাতীয়তার বোধটি এখানে অঙ্কুরিত হয়েছিল এবং তাদের নেতা ও কর্মীদের পরিচর্যায় তার বিকাশ। সেই কারণে নানা অত্যাচার ও নির্যাতন তাদের এক সময় ভোগ করতে হয়েছে। শুনতে হয়েছে পাকিস্তান সংহতির শত্রু, বিদেশী গুপ্তচর, ইসলামের দুশমন ইত্যাদি অভিযোগ। কিন্তু সঠিক সময়ে সঠিক অবস্থান না নিতে পারার কারণে সে সবই ব্যর্থ হয়, সৃষ্টি হয় এক ব্যাপক গণবিচ্ছিন্নতা। আজও সেই গণবিচ্ছিন্নতার মধ্যেই রয়েছে এখানকার বামপন্থীরা। পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর সমস্ত অপকর্মের দোসর জামায়তের ঘৃণ্য ভূমিকা তো জানেন।

একটা সময় বামপন্থীরাই ছিলেন পূর্ব বাংলার প্রধান রাজনৈতিক শক্তি।

প্রশ্ন: যে লক্ষ্য এবং স্বপ্নকে সামনে রেখে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতা প্রাপ্তির ২৬ বছর পর সেই স্বপ্ন কতোটা সফল। কিংবা স্বাধীনতা প্রাপ্তির ছাব্বিশ বছরের এই পর্বটিকে কিভাবে ব্যাখ্যা করবেন?

আহমদ ছফা: প্রথম স্বপ্নটা তো বাস্তবায়িত হয়েছে। বাংলাদেশ একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিশেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। স্বাধীনতার আগে পর্যন্ত বাংলার রাজনীতিকে যারা পরিচালনা করতেন তারা ছিলেন উচ্চবর্গীয় অভিজাত। এখন সন অফ দি সয়েলরা রাজনীতিতে আসছেন। অন্যদিকে আশংকার দিকটি হল এখানে রাতারাতি একটি ইকোনমিক ক্লাস গ্রো

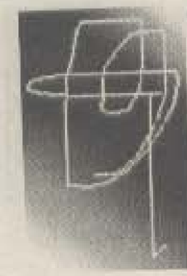

করছে। এই ইকোনমিক ক্লাসটি গড়ে উঠেছে ইকোনমিক প্লানডার (plunder) এবং লুণ্ঠন থেকে। লুণ্ঠনটা হয়েছে ব্যাপক হারে। এমন কয়েকজনকে আমি জানি, মুক্তিযুদ্ধের সময় যাদের ২৫শ' টাকা ছিল না, এখন তাদের ক্যাপিটাল ২৫শ' কোটি টাকা। রাজনৈতিক ক্ষমতাকে প্রয়োগ করে তারা এই টাকা আয় করেছে। এর ফলে যে সমস্যার মধ্যে আমরা পড়েছি–যদি পশ্চিম বাংলার সাথে বিষয়টি তুলনা করি বুঝতে সুবিধা হবে। পশ্চিম বাংলার মত (১৯৯৬) বিধানসভা নির্বাচনের আগের নির্বাচনে (১৯৯১) বর্ধমানে কালু ডোম বলে এক ব্যক্তি কংগ্রেসের এক সর্বভারতীয় নেতাকে পরাজিত করেছিলেন। এ চিত্র আপনি এখানে পাবেন না। কারণ আওয়ামী লীগ বলুন, বিএনপি বলুন, জাতীয় পার্টি বলুন, জামায়াতের কথা একটু স্বতন্ত্র, সব দল চলছে বাংলাদেশের নব্য ধনীদের অবৈধ উপায়ে আয় করা টাকার ওপর। কাজেই পশ্চিম বাংলার কালু ডোমদের মতো কোন প্রতিনিধি বাংলাদেশ সংসদে যেতে পারবেন না। এখানকার পত্রপত্রিকায় ঋণখেলাপি বলে একটা ব্যাপার দেখে থাকবেন। ব্যাংকগুলো থেকে হাজার হাজার কোটি টাকা ঋণ নিয়ে, ঋণ শোধ করা হচ্ছে না। ব্যাংকগুলো এর বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নিতে পারছে না, কারণ এদের পক্ষে আছে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ। বাংলাদেশের সব বুর্জোয়া দল চলে এদের চাঁদায়। এর ফলে বাংলাদেশে যে সংসদীয় ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে সেই সংসদে জনগণের সত্যিকারের চিন্তা-ভাবনা, আশা-আকাঙ্ক্ষার কোন প্রতিফলন ঘটছে না। আপনি ঢাকায় এসে দেখলেন বিএনপির দু'জন এমপি আওয়ামী লীগের মন্ত্রী হলেন। ক্ষমতায় থাকার সময় বিএনপি এবং জাতীয় পার্টি এইভাবে অন্য দলের এমপি ভাগিয়ে এনে মন্ত্রী বানিয়েছিলেন। এইভাবে বাংলাদেশের ক্ষমতার রাজনীতিটা একটা দুষ্টচক্রের মিউজিক্যাল চেয়ারে পরিণত হয়েছে।

প্রশ্ন: এর থেকে উত্তরণের কোন পথ কি আপনি দেখছেন?

আহমদ ছফা: ১৯৭২ সালে 'বুদ্ধিবৃত্তির নতুন বিন্যাস' নামে একটা বই লিখেছিলাম। সাম্প্রতিক তার একটা নতুন সংস্করণ আমার দীর্ঘ ভূমিকাসহ প্রকাশিত হয়েছে। আপনার অনেক প্রশ্নের উত্তর তাতে পাবেন। আমি মনে করি, ১৯৬৫-এর আগে বামপন্থী শক্তির যে ঐতিহ্যটা পূর্ব বাংলায় ছিল তা পুনরুদ্ধার করতে হবে। শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র যুব এবং সাধারণ মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে শোষক শ্রেণীর বিরুদ্ধে তারা যে অবস্থান সে সময় তৈরি করেছিল তা পুনরুদ্ধার না হওয়া পর্যন্ত আমি কোনও ভবিষ্যৎ দেখছি না।

প্রশ্ন: এখানকার বাম দলগুলোর মধ্যে সেরকম কোন উদ্যোগ বা প্রচেষ্টা কি আপনি লক্ষ করছেন?

আহমদ ছফা: বাম দলগুলো নিজেদের চরম ক্ষতি করেছে জাতিমুক্তির প্রশ্নটিকে অনুধাবন করতে না পারার কারণে এ প্রসঙ্গে আমাদের দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক বিন্যাসটা একটু বোঝা দরকার। আমাদের এখানে যদি উৎপাদনভিত্তিক মানে শিল্পপতিরা যদি কলকারখানা তৈরি করতেন, তবে শ্রমিকরা তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী তাদের পলিটিক্স তৈরি করতেন। কোন উৎপাদনভিত্তিক অর্থনীতি এখানে গড়ে ওঠে নি। এখানে যা আছে তা ট্রেডিং। স্বাধীনতার পর শিল্প কারখানা এখানে হয় নি, কিন্তু হওয়া উচিত ছিল। জাতির একটা অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড কোন সরকার তৈরি করতে পারে নি। পরিবর্তে এখানে একটা ট্রেডিং ক্লাস তৈরি হয়েছে এবং এই ট্রেডিং ক্লাসটা টিকে আছে, ট্রেডিং পলিটিক্স-এর কারণে ট্রেডিং ব্যবসায়ীরা দু'ভাবে জনগণকে শোষণ করে। প্রথমত তারা যখন বাইরে কাঁচামাল রফতানি করে এবং দ্বিতীয় যখন বাইরে থেকে ফিনিসড গুডস আমদানি করে। সমস্ত বাম দলগুলোকে এক সাথে বসাবার চেষ্টা করছি, মতবিনিময়ের ব্যবস্থা করতে চাইছি এবং বুদ্ধিজীবীদের দিয়ে একটা কিছু করাতে চাইছি। কিন্তু একবার যদি সুবিধাবাদের দিকে রাজনীতিটা চলে যায়, তবে সেখানে থেকে রাজনীতিকে ফিরিয়ে আনা খুবই মুশকিল। বামপন্থীরা এখন যেটা করছে, তা হল, একটি অংশ হয়তো বিএনপির সাথে, অন্য অংশটি আওয়ামী লীগের এ্যালাইজ (allies) হিশেবে কাজ করছে এগুলো সবই আত্মধ্বংসী।

বাম দলগুলো নিজেদের চরম ক্ষতি করেছে জাতিমুক্তির প্রশ্নটিকে অনুধাবন করতে না পারার কারণে।

প্রশ্ন: বাংলাদেশের রাজনীতিতে বামপন্থীদের নিজস্ব অবস্থান নির্ণয় করার ক্ষমতা অর্জন করতে না পারার কারণ কি? এখানে কি কো দর্শনগত সমস্যা কাজ করছে?

আহমদ ছফা: হ্যাঁ, দর্শনের একটা ক্রাইসিস তো আছেই। কিন্তু আমি মনে করি মার্কসবাদ যদি জগতে ব্যর্থও হ শ্রেণী সংগ্রাম তো ব্যর্থ হবার কথা নয়। মার্কসবাদকে যারা সমাজ পরিবর্তনের একমাত্র টুলস হিশেবে মনে করে এবং যা দেখছেন যে তাদের টুলসটা আর কাজ করছে না, অনিবার্যভাবেই তখন তারা উদ্যম এবং আকাঙ্ক্ষা হারিয়ে ফেলবে কিন্তু মার্কসবাদ সমাজে কাজ না করলেও নির্যাতিত শ্রেণীর সংগ্রাম কি বসে থাকবে?

প্রশ্ন: সে সংগ্রামে কারা নেতৃত্ব দেবেন?

আহমদ ছফা: আমার মনে হয়, বাংলাদেশের সামনের সময়টা বামপন্থীদের অনুকূলে আসবে, যদি তারা সক্রিয় হ যদি তারা মেধা এবং আন্তরিকতা দিয়ে সমস্যাগুলো মূল্যায়ন করেন এবং একটা বিকল্প অর্থনৈতিক উন্নয়নের ছক তারা তৈরি করতে পারেন। এখন একটা বুর্জোয়া সরকার আছে, বিশ্বব্যাংক আছে, এনজিও আছে, মুৎসুদ্দি বুর্জো আছে, এদের বিপরীতে একটা অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড, জাতিকে বাঁচাবার জন্যে একটা উন্নয়নের ছক এবং উপায় আবিষ্ক করা আমার মতে খুব কঠিন কাজ নয়।

প্রশ্ন: ভাষা আন্দোলন থেকে একাত্তরের মুক্তি সংগ্রাম, সব ক্ষেত্রেই ইতিহাস বিকৃতির অভিযোগ উঠছে-

আহমদ ছফা: হ্যাঁ, এটা একটা মজার প্যারাডক্স (টেরটচমস)। যেমন ধরুন বাংলার হিন্দুরা পানিকে জল বলেন, মুসলমানরা জলকে পানি। কিন্তু বাংলার বাইরে সবাই, হিন্দু-মুসলমান উভয়েই পানি বলেন। এই জল-পানি নিয়ে বাংলার হিন্দু-মুসলমানরা একশ বছর লড়াই করছে। যাহা জল তাহাই পানি। যাহা পানি তাহাই জল। এখন আমাদের এখানে কী হচ্ছে। দেশের প্রকৃত সমস্যাগুলো, লড়াইয়ের যে ক্ষেত্রগুলো আছে সেখানে কেউ যেতে চাইছে না বলে কতগুলো প্রতীক তৈরি করা হয়েছে। যে কোন ইতিহাসকে দলীয়করণ করার এই যে অনুদারতা, অসত্যতা, এর কারণ হচ্ছে ইতিহাস বলতে তারা জনগণের ইতিহাস বোঝেন না। বোঝেন দলের ইতিহাস, ব্যক্তির ইতিহাস। ইতিহাস তো জনগণের ইতিহাস হবে। কিন্তু এখানে নেতা এবং দলের ইতিহাস সবাই তুলে আনছেন। এর কারণ হচ্ছে, সংঘাতের আসল ক্ষেত্র থেকে, জনগণকে সংঘাতের প্রতীকে ফেরত নেয়া। যেমন আমরা বাঙালি না বাংলাদেশী, বাঙালি না মুসলমান? এগুলো একটা থেকে আর একটার বিরোধী নয়। আমরা যেমন বাঙালি, তেমনি বেশির ভাগ লোক মুসলমান। আমরা যেমন বাংলাদেশী তেমনি বাঙালিও। কিন্তু এগুলো তৈরি করা হচ্ছে, ক্ষমতার মালিকানা কে নেবে, এখান থেকেই ইতিহাস বিকৃতিটা সৃষ্টি করা হচ্ছে। ফরাসি বিপ্লবের সঠিক ইতিহাস এখনো অনুসন্ধান হচ্ছে। রুশ বিপ্লবের সময় স্ট্যালিন এবং ট্রটস্কির ভূমিকা নিয়ে লাখ লাখ পাতা লেখা হচ্ছে। বাংলাদেশ সৃষ্টির এত বড় একটা ঘটনা, সেটা নিয়ে মতদ্বৈততা, বিতর্ক এসব থাকবে, এটাই স্বাভাবিক। একাত্তরের যুদ্ধ বাঙালির জাতীয় জীবনে শ্রেষ্ঠ ঘটনা। কিন্তু এখানে সবাই মিথ্যে বলছেন কেন? মিথ্যেকে পুজো করছেন কেন? এর একমাত্র কারণ মিথ্যে বললে এখানে রাজনৈতিকভাবে লাভবান হওয়া যায়।

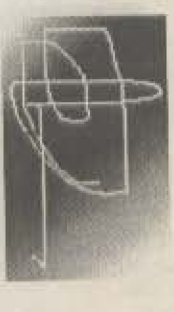

***প্রশ্ন:** ভাষা আন্দোলন থেকে যে অসাম্প্রদায়িক জাতি চেতনার উন্মেষ তার চূড়ান্ত রূপ স্বাধীনতা। এই সূত্রে আশা করা গিয়েছিল বাংলাদেশ একটি অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিশেবে বিকশিত হয়ে উঠবে। ওই আশার পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান বাংলাদেশকে কিভাবে ব্যাখ্যা করবেন?*

আহমদ ছফা: প্রথমত আমি অনেকগুলো পরিচিত চিন্তার বিরোধিতা করব। যারা ভাষা আন্দোলন করেছিলেন, তারা ছিলেন মধ্যবিত্ত ছাত্র, বেশির ভাগ মুসলমান। আওয়ামী মুসলিম লীগের সকল নেতৃবৃন্দ এককালে ছিলেন পাকিস্তানি। আমার শিক্ষক আব্দুল রাজ্জাক সেদিন কথা প্রসঙ্গে আমাকে বললেন, তাঁর কাছে শেখ মুজিবের কিছু ছবি আছে, সেই সব ছবিতে জিন্নাহ মারা যাবার পর শেখ মুজিব হাউমাউ করে কাঁদছেন। হিন্দু-মুসলমানদের ভিত্তিতে দেশটা ভাগ হল। তারপর পশ্চিমাদের সাথে লড়াই করতে গিয়ে তারা (বাঙালি মুসলমান) পারে না। এল সোহরাওয়ার্দীর যুক্ত নির্বাচন। এইভাবেই একটা প্রেক্ষিত তৈরি হল এবং বাঙালি মুসলমান বাঙালি হিন্দুদের টেনে আনলেন। এ ক্ষেত্রে প্রেমের চাইতে যে জিনিসটা বেশি কাজ করেছে, তা হল তাদের বাস্তব প্রয়োজন। অর্থাৎ যে অর্থে অসাম্প্রদায়িক ইত্যাদি বলতে আমরা যা চিন্তা করি, একটা আইডিয়াল সিচুয়েশন, সেটা বোধ হয় এ ক্ষেত্রে কল্পনা করা ঠিক হবে না। তবে কোলকাতা থেকে এটা কল্পনা করার বোধ হয় সময় এসেছে এই কারণে যে, ভাষা আন্দোলন তার নিজস্ব প্রেক্ষিত ছাড়িয়ে বাঙালি জাতির ইতিহাসে অন্যরকম একটা তাৎপর্য নিয়ে আসছে। কিন্তু উৎসের (ভাষা আন্দোলনের) দিকে গেলে দেখব লক্ষ্য ছিল চাকরি/বাকরি ইত্যাদি। আগেই বলেছি, একুশে ফেব্রুয়ারির সময় আমি থ্রি ক্লাসের ছাত্র। ছাত্র বয়সে বাংলা ভাষার দাবিতে মিছিলে গেলে এসব কথা আমরা শুনতাম। উর্দু রাষ্ট্রভাষা হলে, বাংলায় পাস করে আমরা চাকরি পাব না, দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হব, পশ্চিম পাকিস্তানের কাছে হেরে যাব। সেই সময় শহীদুল্লাহ সাহেবের (ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ) একটা কথা-পাকিস্তানিরা যখন বলল, ইসলামের ভিত্তিতে যেহেতু পাকিস্তান, তাই ইসলামের ভাষা উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করা হবে। শহীদুল্লাহ সাহেব বললেন, ইসলামকেই যদি তোমরা অগ্রাধিকার দিতে চাও তবে আরবিকে রাষ্ট্রভাষা কর, তোমরাও শিখবে, আমরাও শিখব। পশ্চিম পাকিস্তানিরা তাতে রাজি হয় না। এইভাবে নানা প্রক্রিয়ার মধ্যে ভাষা আন্দোলনে আজকে আমরা যা আবিষ্কার করেছি সেই জিনিসটা প্রথমে ছিল না।

'চীন দেখে এলাম' বইতে মনোজ বসু লিখেছিলেন, শেখ মুজিব পিকিং-এ তাকে কথা প্রসঙ্গে বলেছিলেন যে, আমরা পূর্ব বাংলাকে স্বাধীন করে ছাড়ব। পাক-ভারত যুদ্ধের সময় মনোজ বসু বইটা প্রত্যাহার করে নেন। পূর্ব বাংলাকে স্বাধীন করার চিন্তা শেখ সাহেবের মনে থেকে থাকতে পারে। আমার মনে হয় এতে কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে পড়েছে। বীরেন শাসমলের ছেলে বিমলানন্দ শাসমল, 'ভারত যখন স্বাধীন হচ্ছে' নামে একটা বই লিখেছেন। সেই বইতে তিনি লিখেছেন, আজকে যে কারণে আমরা শেখ মুজিবকে মালা দিই, সেই একই কারণে শেখ আব্দুল্লাহকে জেলে পাঠাই।' বাংলাদেশ স্বাধীন হতে পেরেছে প্রথম ভৌগোলিক দূরত্বের কারণে। ভারতের সাথে কাশ্মীরে কন্টিগিউয়াস (contiguous) এরিয়া। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টি দেখলে বিষয়টির প্রতি সুবিচার করা হবে। আর এ সমস্ত ইস্যুতে আমি একজন সামান্য মানুষ। চূড়ান্ত মতামত দেবার ক্ষমতা আমার নেই।

***প্রশ্ন:** বাংলাদেশের অনেক কবি, সাহিত্যিক দাবি করেন, ঢাকাই হবে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের রাজধানী। এই দাবির যৌক্তিকতা কতটা আছে-*

আহমদ ছফা: 'রাজধানী' করার শব্দটা খুব ভাল শব্দ নয়। তবে এ শব্দটা প্রথম উচ্চারণ করেছেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। এরা তো ব্যবসায়ী লেখক, যখন যেখানে যেমন বোঝেন কোপ মারেন। আবার 'দেশ' পত্রিকার বর্তমান সংখ্যায় (২১

আওয়ামী মুসলিম লীগের সকল নেতৃবৃন্দ এককালে ছিলেন পাকিস্তানি।

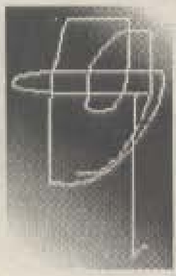

> অনেকে কোলকাতার প্রকাশকের কাছ থেকে ট্রেসিং নিয়ে এসে এখানে ছেপে বিক্রি করতেন। এতে বাংলাদেশের বইমেলা বা বইয়ের বাজারে বই বিক্রি হত না।

ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮ সংখ্যা) 'প্রবাসে বাংলা ভাষা'য় বাংলাদেশের ভূমিকাকে তিনি গৌণভাবে দেখিয়েছেন। রাজধানী শব্দটা আমি পছন্দ করি না। কারণ মানুষ যেখানে থাকেন, তার সংস্কৃতিও সেখানে থাকে। এক সময় ব্রজবুলি সাহিত্য তৈরি হয়েছিল, এক সময় মঙ্গলকাব্য লেখা হয়েছিল, এক সময় পুঁথি সাহিত্য তৈরি হয়েছিল। সারা বাংলা জুড়ে নানা বাঁকে নানা সাহিত্য তৈরি হয়েছিল। বাংলাদেশের সাহিত্য এখানকার পরিবেশ, প্রতিবেশ, এখানকার জীবন, সংগ্রাম, রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা এসব নিয়ে লেখা হবে। পশ্চিম বাংলার সাহিত্য সেখানকার মতো করে বিকশিত হবে। তবে বাংলা ভাষার প্রশ্নটা স্বতন্ত্র। বাংলা এখানে রাষ্ট্রভাষা, জাতীয় ভাষা। সেই কারণে বাংলা ভাষা এখানে যে পেট্রোনাইজেশনটা পাচ্ছে সেটা পশ্চিম বাংলায় বাংলা ভাষা পাচ্ছে না। বাংলা ভাষা ওখানে (পশ্চিম বাংলায়) একটি 'প্রাদেশিক' ভাষা, এবং হিন্দির দ্বারা চূড়ান্তভাবে কোণঠাসা। পশ্চিম বাংলায় বাংলা ভাষার জন্যে যে পেট্রোনাইজেশনটা দরকার আর্থিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক কোন ক্ষেত্রেই বাংলা ভাষা সেখানে তা পাচ্ছে না কারণ জাতিগতভাবে বাঙালি সেখানে স্বাধীন নয়। বাংলাদেশের সাহিত্যের ক্ষেত্রে যারা খুব পরিচিত, একটা সময় পর্যন্ত তারা এখানকার সাহিত্যকে সার্ভ করেছেন তাদের অনেকেই এখন সাহিত্য ক্ষেত্রে একটা সময় যারা জ্বলে উঠেছিলেন, তাদের অনেকেই এখন বর্জ্য পদার্থের কাছাকাছি এসে গেছেন। নতুন প্রজন্মের মধ্যে পলিটিক্যাল ডেসটিনি না থাকলে, পলিটিক্যাল গোল ক্লিয়ার না থাকলে, শিল্প সাহিত্য তার প্রধান ভিকটিম হয়। এখন বাংলাদেশের চিত্র কোনদিকে যাবে তার দিশা নেই। আপনি দেখবেন হাজার হাজার পাতা পত্র-পত্রিকা ছাপা হচ্ছে। কিন্তু স্পর্শ করার মত পঞ্চাশটি পাতা আপনি সেখানে পাবেন না। কাজেই অতি কথন করে লাভ নেই। তবে বাংলাদেশের একটি সম্ভাবনা আছে, সেই সম্ভাবনাকে যদি এক্সপ্লয়েট করতে পারি, তবে বাংলার এই অংশের সাহিত্যে একটা নতুন যুগ আসতে পারে। এবং তা যদি হয় তবে পশ্চিম বাংলার বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সামনে চ্যালেঞ্জগুলো আছে, সেসব মোকাবিলা করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ কিছু শক্তি ও প্রেরণা দিতে পারবে। 'রাজধানী' শব্দটা সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় কয়েন করেছিলেন বাংলাদেশে বই বেচার জন্যে।

প্রশ্ন: পশ্চিম বাংলার সাহিত্য -সংস্কৃতি বাংলাদেশের সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রতিদ্বন্দ্বী না পরিপূরক?

আহমদ ছফা: কোন সাহিত্য বা সংস্কৃতি কারো প্রতিদ্বন্দ্বী হয় না। সাহিত্য-সংস্কৃতি হচ্ছে প্রবাহে প্রবাহে সম্মিলন। ধর্ম প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারে, হয়। কিন্তু সাহিত্য-সংস্কৃতি কখনই নয়।

প্রশ্ন: পশ্চিম বাংলার বই আমদানির ফলে বাংলাদেশের সাহিত্য এবং প্রকাশনা শিল্প মার খাচ্ছে। এমন অভিযোগ বাংলাদেশের সাহিত্য এবং প্রকাশনার স্বার্থে পশ্চিম বাংলার বই আমদানি বন্ধ করার কথাও শুনেছি এবং পশ্চিম বাংলার কোন বইকে এ বছর (১৯৯৮) ঢাকার একুশের বই মেলায় ঢুকতে দেয়া হয় নি। এ বিষয়ে-

আহমদ ছফা: আগে যেটা হত আমদানি তো হতই, অনেকে কোলকাতার প্রকাশকের কাছ থেকে ট্রেসিং নিয়ে এসে এখানে ছেপে বিক্রি করতেন। এতে আমাদের বইমেলা বা বইয়ের বাজারে আমাদের (বাংলাদেশের) বই বিক্রি হত না। ঐতিহাসিক কারণে দীর্ঘদিন ধরে এখানে কোলকাতার বইয়ের একটা বাজার ছিল এবং কোলকাতার সেই বইয়ের বাজারকে চ্যালেঞ্জ করার মত কোনও বইয়ের বাজার এখানে গড়ে ওঠে নি। বই লেখা তো যথেষ্ট নয়, বই প্রমোট করা, বইয়ের আলোচনার করা, নানা কারণে সেসব এখানে হয় নি। স্বাধীনতার পর নানারকম রাজনৈতিক দুর্বিপাকে পড়ে আমাদের গ্রন্থশিল্পটা বিকশিত হতে পারে নি। কিন্তু কোলকাতার গ্রন্থশিল্প অনেকদিন আগে থেকেই বিকশিত। সেই সূত্রে কোলকাতার বই বাংলাদেশের সমস্ত বইয়ের বাজার প্রায় দখল করে নিল। এর মধ্যে আনন্দবাজারের বই-ই ছিল শীর্ষে। পুলিশ দিয়ে এটা বন্ধ করা যায় না। ১৯৯৪ সালে আমি বুকে পোস্টার দিয়ে এর প্রতিবাদ করলাম। অন্য কোন প্রকাশকের বই নয়। আমার প্রতিবাদ শুধু আনন্দবাজারের বইয়ের বিরুদ্ধে। যে বইয়ের জন্যে ইলিয়াসকে (আখতারুজ্জামান ইলিয়াস) আনন্দ পুরস্কার দেয়া হয়েছে, সেই বইতেই (খোয়াবনামা) আনন্দবাজারকে বলা হয়েছে বাঙালি জাতির শত্রু। বাংলা ভাগ করার পেছনে এই পত্রিকাটির ভূমিকা অনেক। আমরা যখন ভাষা আন্দোলন করছি, সমর সেনের 'বাবু বৃত্তান্ত' পড়ুন, তখন রায়ট লাগাবার জন্যে ইলিশের পেটে হিন্দু রমণীর মস্তক পাওয়া গেছে বলে সংবাদ লিখে আনন্দবাজার সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ছড়িয়েছে এবং তসলিমাকে নিয়ে আনন্দবাজার যা করেছে গোটা দুনিয়ার কাছে আনন্দবাজার বাংলাদেশকে তুলে ধরল একটি সাম্প্রদায়িক ও মৌলবাদী দেশ হিশেবে। কিন্তু কে মৌলবাদী, ভারত না বাংলাদেশ? মৌলবাদী উত্থান হচ্ছে ভারতে, বিজেপি এবার দিল্লির ক্ষমতায় আসছে। অন্যদিকে বাংলাদেশের সংসদে এবার জামায়াত পেয়েছে মাত্র তিনটি আসন। এই আনন্দবাজারের দৌরাত্ম্য আমরা বাংলাদেশে চলতে দেব না। বই যেমন সংস্কৃতির বাহন, তেমনি তা পণ্য। ইকোনমিক্স-এ একটা কথা আছে-Nurse the baby portect the child, Free the adult আমাদের প্রকাশনা শিল্প অডতলট না হওয়া পর্যন্ত বিশেষ কিছু ব্যবস্থা নিতেই হবে।

ভারতের বইয়ের কপিরাইট কিনে এখানকার প্রকাশকরা ছাপুন আপত্তি নেই। সুনীলের (গঙ্গোপাধ্যায়) কোন বই কপি রাইট কিনে এখানে ছাপা হলে আমাদের কমপোজিটার, ছাপাখানা, দপ্তরি,পাইকার সবাই টাকা পাবে। তবে Medical Science, Technology – এর বইয়ের ক্ষেত্রে আমরা একথা বলি না। কারণ এসব বই আমেরিকা থেকে আনলে যদি পাঁচ'শ ডলার লাগে, ভারত থেকে আনতে লাগবে এক'শ ডলার। এবং আনন্দবাজার ছাড়া অন্যান্য প্রকাশনার বইয়ের ব্যাপারে আমরা বিরোধিতা করি না।

প্রশ্ন: কোলকাতার বইমেলায় তো--

আহমদ ছফা: (উত্তেজিতভাবে প্রশ্ন শেষ করতে না দিয়ে) দেখুন, আমরা ভাষার জন্যে রক্ত দিয়েছি, রক্ত দিয়ে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ভাষাভিত্তিক স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছি। আমরা কেন কোলকাতাকে অনুসরণ করতে যাব। আপনার পত্রিকাতেই পড়েছি-কোলকাতা বই মেলার আমন্ত্রণপত্রে প্রথমে হিন্দি তারপর ইংরেজি এবং শেষ তিন নম্বরে বাংলার স্থান। যদি ভবিষ্যতে পশ্চিম বাংলায় ওই তিন নম্বর স্থান থেকেও বাংলা ভাষা মুছে যায় মোটেই অবাক হবো না। কারণ এটাই ভারত সরকারের পলেসি এবং এতেই ভারতের 'ঐক্য সংহতি' দৃঢ় হবে। আমাদের একুশের মেলা বাংলা ভাষার মেলা, বাংলাদেশের বইমেলা। একটি স্বাধীন জাতি হিশেবে, স্বাধীনভাবেই আমাদের চলার পথ আবিষ্কার করতে হবে। আপনারা (পশ্চিম বাংলা ও ভারতের বাঙালিরা) জাতি হিশেবে স্বাধীন নন। আপনাদের ভাষাও সেখানে স্বাধীন নয়, আপনারা দিল্লি এবং হিন্দি সমান। সবক্ষেত্রে দিল্লি এবং হিন্দির নির্দেশ মেনেই আপনাদের চলতে হয়। পরাধীন জাতি হিশেবে স্বাধীনভাবে চলার ক্ষমতা আপনাদের নেই। মানসিকভাবেও এই দাসত্বকে আপনারা (ভারতের বাঙালিরা) মেনে নিচ্ছেন। কারণ 'ভারতের ঐক্য সংহতি রক্ষা'র দায় এখন আপনাদের কাঁধে। তাই স্বাধীন হবার ইচ্ছেও আর থাকছে না। কিন্তু আমরা 'পাকিস্তান সংহতি'কে কবরে পাঠিয়ে দেশকে স্বাধীন করেছি। তাই পশ্চিম বাংলা বা কোলকাতাকে এ ক্ষেত্রে আমরা অনুসরণ করতে যাব না। যদি কোনদিন স্বাধীন হয়ে স্বাধীন চিন্তা এবং পথকে আবিষ্কার করতে পারেন, সেদিন নিশ্চয় আমরা পশ্চিম বাংলা ও কোলকাতার দিকে তাকাব।

প্রশ্ন: আপনি আনন্দবাজারের প্রকাশনার কথা বললেন, কিন্তু অন্য প্রকাশনার বইও তো এবারের একুশের বইমেলায় ছিল না?

আহমদ ছফা: না, একুশের মেলার বিষয়টা আলাদা। একুশের মেলা ছাড়া অন্য যেসব বইমেলা হয় তাতে থাকে। একুশের মেলা হল বাংলাদেশের লেখকরা কতটুকু উঠলেন, কতটুকু বিকশিত হলেন তার মান নির্ণয়ের মেলা। এখানে অন্য বই থাকবে না। আন্দোলন করে একুশের মেলাটিকে আমরা নিজেদের বইয়ের মেলা করতে চাইছি।

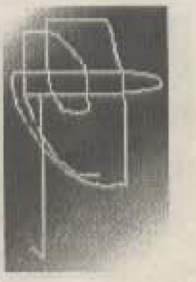

প্রশ্ন: বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমানার বাইরে অন্য কোনও স্থানের বই একুশের মেলায় থাকবে না। এই দাঁড়াচ্ছে মূল ব্যাপারটা-

আহমদ ছফা: হ্যাঁ, তবে কোনও ভারতীয় বই যদি বাংলাদেশে ছাপা হয় তবে সে বই মেলায় থাকতে পারবে। এইটুকু যদি না করতে পারি, তবে দেশটাকে স্বাধীন করেছিলাম কেন? আমার একটা অভিজ্ঞতার কথা আপনাকে বলি। একবার আনন্দবাজারের বাদল বসু আমার একটা ইন্টারভিউর প্রতিবাদ করে খুব খারাপ কথা বলেছিলেন। তারপর আমাদের দেশের প্রবীণ লেখক শওকত ওসমান বললেন, আহমদ ছফা খুব খারাপ লোক। উনি (শওকত ওসমান) খুব খারাপ শব্দ ব্যবহার করেছিলেন, সেই শব্দটা আমি বলছি না। এরপর একদিন আমি শওকত ওসমানকে সাথে নিয়ে ঢাকার নিউ মার্কেটে গেলাম। নিউ মার্কেটের সব বইয়ের দোকানে শওকত ওসমানের বই চাইলাম, কিন্তু কোনও বইয়ের দোকানই শওকত ওসমানের কোনও বই দিতে পারে না। কিন্তু যখন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের বই চাইলাম, দেখা গেল মুদির দোকানও তা দিতে পারে। শেষে আমি শওকত ওসমানকে বললাম, সুনীল আপনার বড় না ছোট? তিনি বললেন, ছোট, অনেক ছোট। ওকে আমি জন্মাতে দেখেছি। আর জানবেন শওকত ওসমান লেখক হিশেবে ছোট লেখক নন, তার অনেক লেখা আছে উৎকর্ষের বিচারে যা বেশ ভাল। এই অবস্থা দেখে আমি শওকত ওসমানকে বললাম, দেশটা আমরা বাল ছেঁড়ার জন্যে স্বাধীন করেছি? আনন্দবাজার 'দেশ' পত্রিকার ২১ ফেব্রুয়ারি (১৯৯৮) সংখ্যায় বদরুদ্দীন উমরের রচনা নিয়ে যা করল, এসব বদমাইশি আর আমরা হতে দেব না। আপনি তো দীর্ঘদিন ধরে কোলকাতায় একুশে ফেব্রুয়ারি বিষয়ে কাজ করছেন। আর আনন্দবাজার আজকে একুশে ফেব্রুয়ারি বিষয়ে সংখ্যা বের করেছে স্রেফ বাংলাদেশে তাদের মার্কেট রাখার উদ্দেশ্যে।

প্রশ্ন: দিন কয়েক আগেই স্বাধীন বাংলা পত্রিকার জন্যে বদরুদ্দীন উমরের একটি সাক্ষাতকার আমি গ্রহণ করেছি। সেই সাক্ষাতকারে বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস বিকৃতি প্রসঙ্গে আমার প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানিয়েছেন যে, এ বিষয়ে দেশ পত্রিকায় (২১ ফেব্রুয়ারি '৯৮ সংখ্যায়) তার (বদরুদ্দীন উমর) একটি লেখা প্রকাশের জন্যে বাংলাদেশ সরকার দেশ পত্রিকার ওই সংখ্যাটি এখানে (বাংলাদেশে) নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। বদরুদ্দীন উমর আনন্দবাজারের বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ কিন্তু জানান নি। বরং আমাকে কোলকাতায় গিয়ে তার লেখাটি পড়তে বলতেন। বাংলাদেশ সরকার যদি 'দেশ' পত্রিকার কোনও সংখ্যা এখানে আসতে না দেয়, তা হলে আনন্দবাজারের কী করার থাকতে পারে? এবং এখানে তাদের 'বদমাইশিটাই বা কোথায়?

আহমদ ছফা: হ্যাঁ, ওই পর্যন্ত ঠিকই আছে। কিন্তু তারপর আরও কিছু ঘটনা ঘটেছে, কিংবা সব ঘটনাটি জেনেছি। ব্যাপারটা হচ্ছে- 'দেশ' পত্রিকা একুশে ফেব্রুয়ারি সংখ্যার জন্যে ভাষা আন্দোলনের গবেষক লেখক বদরুদ্দীন উমরের কাছে একটি লেখা চাইলে, উমর তাদের জানান যে, তিনি আনন্দবাজার পত্রিকার ঘরানার লেখক নন। এরপর আনন্দবাজার পত্রিকার পক্ষ থেকে বদরুদ্দীন উমরকে জানানো হয় যে, ভাষা আন্দোলনের ওপর তিনি যা লিখবেন তাই দেশ পত্রিকায় ছাপা হবে। এবং দেশ পত্রিকায় উমরের ওই লেখাটি ছাপা হলে দেশ পত্রিকার ওই সংখ্যার চালান বর্ডারে আটকে দেয়া হয়। এতে দেশ পত্রিকার সম্পাদক উমরের লেখাটি প্রকাশ করার জন্যে কোলকাতার বাংলাদেশ ডেপুটি হাই কমিশন মারফত বাংলাদেশ সরকারের কাছে দুঃখপ্রকাশ করে ক্ষমা চায় এবং উমরের লেখাটি পত্রিকা থেকে বাদ দিয়ে শওকত আলীর একটি লেখা যোগ করে দেয় পত্রিকার ওই সংখ্যাটি বাংলাদেশে পাঠানো হয়েছে। শওকত আলীর লেখাটিও ২১

আমাদের একুশের মেলা বাংলা ভাষার মেলা, বাংলাদেশের বইমেলা। একটি স্বাধীন জাতি হিশেবে, স্বাধীনভাবেই আমাদের চলার পথ আবিষ্কার করতে হবে।

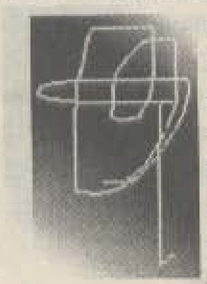

ফেব্রুয়ারি সংখ্যার জন্যে দেশ পত্রিকার পক্ষ থেকে লেখকের কাছ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছিল। কিন্তু দেশ পত্রিকার মূল সংখ্যায় শওকত আলীর লেখাটি ছিল না। পরে যখন তারা (দেশ পত্রিকা) বদরুদ্দীন উমরের লেখাটি পত্রিকা থেকে বাদ দেন তখন সেই শূন্যস্থান তারা পূরণ করেন শওকত আলীর লেখাটি দিয়ে। কিন্তু শওকত আলীর পুরো লেখাটিও দেশ ছাপে নি, ছেপেছে তাদের সুবিধামত। দেশ পত্রিকার ২১ ফেব্রুয়ারি '৯৮ সংখ্যা পশ্চিম বাংলায় বের হল এক রকমভাবে, দেশ পত্রিকার সেই একই সংখ্যা বাংলাদেশে এল অন্য চরিত্র এবং চেহারা নিয়ে। এই মিথ্যাচার ও কপটতা আনন্দবাজারের পক্ষে সম্ভব। লেখা চেয়ে নিয়ে লেখা ছাপার পর তা পত্রিকা থেকে বাদ দেয়া এবং লেখাটি আনন্দবাজার ভুল করে ছেপেছে বলে কোলকাতার ডেপুটি হাই কমিশনারের কাছে ক্ষমা চাওয়া এবং অন্য লেখা যোগ করে তা (দেশ পত্রিকা) এখানে পাঠানো এসব করতে গিয়ে আনন্দবাজার একবারও বদরুদ্দীন উমর কিংবা শওকত আলীকে কিছু জানাবার প্রয়োজন অনুভব করেন নি। আপনি বলুন এসব বদমাইশি ছাড়া আর কি?

আমাদের ইতিহাস আমরা লিখব না, লিখবে আনন্দবাজার। এত রক্তের বিনিময়ে আমাদের স্বাধীনতা, তার একটা দাম আছে। একবার নীরদ চৌধুরী 'তথাকথিত বাংলাদেশ' লেখার কারণে দেশ পত্রিকা এখানে বন্ধ হয়ে যায়। এতে সাপ্তাহিক দেশ পাক্ষিকে পরিণত হয়। এখন যদি 'দেশ' আমরা বাংলাদেশে ঢুকতে না দেই তবে তা মাসিক হবে। সেটা আমরা এখনই করতে চাই না, কারণ পশ্চিম বাংলায় বাংলা ভাষাটা টিকিয়ে রেখেছেন লেখকরা। আর কোনও ক্ষেত্রেই বাংলা ভাষার চর্চা নেই। বাংলা ভাষার ওপর ওখানে (পশ্চিম বাংলায়) যে আক্রমণটা চলছে সেই সময় আমরা যদি পশ্চিম বাংলার বই আমদানি বন্ধ করে দেই, তবে তার সুযোগ নেবে এখানকার মৌলবাদীরা এবং ওখানকার বাংলা ভাষা চর্চা চরম বিপদে পড়বে। দীর্ঘদিন ধরে পশ্চিম বাংলার রাজনীতি এবং অর্থনীতি বাংলা ভাষার অনুকূলে নয়। পশ্চিম বাংলার অর্থনীতি সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করে মাড়ওয়ারী এবং গুজরাটিরা। আর রাজনীতি নিয়ন্ত্রিত হয় দিল্লি থেকে। এমনকি বামফ্রন্ট সরকারকেও সবার আগে প্রাধান্য দিতে হয় হিন্দি বলয়ের স্বার্থকেই। এই হিন্দি বলয়ই ভারতবর্ষকে নিয়ন্ত্রণ করে। এত প্রতিকূলতার মধ্যেও যে বাংলা ভাষা পশ্চিম বাংলায় টিকে আছে তার কারণ সেখানকার লেখকরা এখনো বাংলা ভাষায় লিখছেন। বাংলা ভাষার প্রতি প্রেমের কারণেই আমরা পশ্চিম বাংলার এই আমদানি বন্ধ করছি না। এমনকি আমরা চাই না 'দেশ' পত্রিকার মত একটি কাগজ বন্ধ হয়ে যাক। পশ্চিম বাংলার প্রতি আমাদের এই অনুভবটা আপনি পৌঁছে দেবেন। বাবরি মসজিদ ভাঙ্গার পর বাংলাদেশে তিনজন মানুষ মারা গেছেন। আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এখানকার 'ভোরের কাগজ' পত্রিকায় একটি সাক্ষাতকারে বলেছে, কোলকাতা শহরতলীতেই মারা গেছেন ১শ' জন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একশ জনকে আমরা পঞ্চাশ ধরতে পারি। এই তিনজন মানুষের মৃত্যুকে নিয়ে পৃথিবীব্যাপী আনন্দবাজার যে কাণ্ডটা করল এটা কোনও দরিদ্র প্রতিবেশীর প্রতি কোনও ভদ্রলোক করে না। মনে বিষ না থাকলে এটা সম্ভব নয়।

তিনজন মানুষের মৃত্যুকে নিয়ে পৃথিবীব্যাপী আনন্দবাজার যে কাণ্ডটা করল এটা কোনও দরিদ্র প্রতিবেশীর প্রতি কোনও ভদ্রলোক করে না।

প্রশ্ন: যদি বলা হয় প্রতিযোগিতায় দাঁড়াতে না পারার কারণে এই ক্ষোভ?

আহমদ ছফা: হ্যাঁ, একথা বলতে পারেন। তবে আমি রেপড হচ্ছি আপনি ভাববেন না আমি মজা পাচ্ছি। আনন্দবাজারের একটা সাকসেসফুল ব্যাপার আছে। পশ্চিম বাংলার বাঙালির টাকা নেই। কিন্তু আনন্দবাজার টাকা করেছে। সাহিত্যটাকে তারা ব্যবসায়ের পণ্যে পরিণত করেছে এবং সমস্ত লেখককে তারা পূজা সংখ্যার লেখক-এ পরিণত করেছে। তারা তাদের পঁচাত্তর বছরের ঐতিহ্য দিয়ে বাংলাদেশের গ্রোয়িং প্রসেসে হস্তক্ষেপ করছে। একজন সাধারণ লেখককে পুরস্কার দিয়ে তুলে ধরে, অন্যদিকে একজন সত্যিকারের ভাল লেখককে অপমান করে। যেমন তারা তসলিমা নাসরিনকে পুরস্কার দিয়ে দুই কোটি টাকা আয় করেছে। আপনি যদি চান আমি হিশাব দেব। এখানে তারা পাঁচটি আনন্দ পুরস্কার দিয়েছে। এর মধ্যদিয়ে ভারতীয় সংস্কৃতির আগ্রাসনের হস্ত এখানে প্রসারিত হচ্ছে। হিন্দির এত বড় এজেন্ট হচ্ছে আনন্দবাজার। আমি এইভাবেই ব্যাখ্যা করব। জানি না আপনারা পশ্চিম বাংলার লোকেরা কিভাবে ব্যাখ্যা করবেন। নানাভাবে ভারত ফাঁদ পেতে রাখছে। সেই ফাঁদে আমাদের পড়ার অপেক্ষা। আমরা যদি ভারতবর্ষের ফাঁদে পড়ি, পশ্চিম বাংলার লোকদের কর্তব্য হবে– আমাদের স্বাধীন অবস্থানকে টিকিয়ে রাখতে সাহায্য করা। না হলে পশ্চিম বাংলার বাঙালিদের অবস্থাও গয়া হবে। পশ্চিম বাংলার আপনারা বাঙালির ভাষা-সংস্কৃতি ও স্বাধীন অস্তিত্ব রক্ষা করার চেষ্টা করছেন, তার পিছনে বাংলাদেশের স্বাধীনতার অস্তিত্ব একটি প্রেরণা হিশেবে কাজ করছে। একটি স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্র হিশেবে বাংলাদেশ তার নিজের পায়ে উঠে দাঁড়াক, রাজনৈতিক স্বার্থেই দিল্লির শাসকরা এবং তাদের প্রধান এজেন্ট আনন্দবাজার তা চায় না।

প্রশ্ন: বিষয়টি যদি ব্যাখ্যা করে বলেন –

আহমদ ছফা: পাকিস্তান ভেঙে যদি পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিরা নিজেদের একটি স্বাধীন রাষ্ট্র তৈরি করতে পারেন তবে বহুজাতিক ভারতবর্ষের বিভিন্ন জাতিগুলোই বা তা পারবেন না কেন? এবং কোন অধিকারে দিল্লি তামিল, তেলেগু, মালায়ালাম, ওড়িয়া, অসমিয়া, বাঙালি, কাশ্মীরী, নাগা ইত্যাদি জাতিগুলোর ওপর রাজনৈতিক শাসন, অর্থনৈতিক শোষণ এবং তাদের নিজস্ব ভাষা-সংস্কৃতির ওপর হিন্দির স্টিমরোলার চালাবে? আনন্দবাজার শুধু বাংলাদেশের নয়, পশ্চিম বাংলার বাঙালিদেরও শত্রু এবং বাঙালির জাতিগত অস্তিত্বের প্রয়োজনে শুধু দিল্লি বা হিন্দির বিরুদ্ধে নয়,

আনন্দবাজারের বিরুদ্ধেও একদিন আপনাদের (পশ্চিম বাংলার বাঙালিদের) দাঁড়াতে হবে। ফারাক্কা তৈরি করেছিল বাংলাদেশের ক্ষতি করার জন্যে। কিন্তু ফারাক্কার কারণে পশ্চিম বাংলার কম ক্ষতি হয় নি। ভারতের পানি অবরোধের বিরুদ্ধে মওলানা ভাসানী যখন ফারাক্কা অভিযান (১৯৭৬) করেছিলেন, আপনি লক্ষ্য করে দেখবেন, আনন্দবাজার কি কুৎসিত এডিটোরিয়াল লিখেছেন। এখন আবার দেখবেন, কিভাবে তারা ভাষা পাল্টালেন। বাংলাদেশের রস পায় বলে পশ্চিম বাংলায় আনন্দবাজার দাঁড়িয়ে আছে। আনন্দবাজারকে কিভাবে টৌন ডাউন করতে হয় আমরা জানি। এমনিতে আনন্দবাজার যথেষ্ট ভাল বই ছাপে, দেশ পত্রিকা অত্যন্ত সুসম্পাদিত একটি পত্রিকা। কিন্তু একটি পত্রিকা একটি জাতির সাহিত্যকে সম্পূর্ণ কুক্ষিগত করে রাখে, এটা পৃথিবীর অন্য কোথাও আপনি পাবেন না।

প্রশ্ন: নিজস্ব কোনও সাহিত্য ধারা কি আপনারা এখানে তৈরি করতে পেরেছেন?

আহমদ ছফা: এখনো আমরা পারি নি। কিন্তু আমরা বসে থাকব, এটা ভাবাও ঠিক নয়।

প্রশ্ন: পশ্চিম বাংলার পাঠকদের সম্পর্কে -

আহমদ ছফা: পশ্চিম বাংলার পাঠকরা এত ভাল। সেখানে গলির মোড়ে মোড়ে বিদগ্ধ লোক পাওয়া যায়। দেশ পত্রিকাতে যে সমস্ত পাঠক চিঠি লেখেন, চিঠিগুলো যেভাবে গুছিয়ে লেখেন, পৃথিবীর খুব কম দেশেই এমন গুছিয়ে লেখেন। অন্য পাঁচটা দেশের সাহিত্য এবং পত্রিকা পড়েই একথা বলছি। পশ্চিম বাংলায় ভাল মানুষের সংখ্যা কম নয়, অনেক Unfortunately তারা অসহায়। অর্থনৈতিকভাবে তারা অসহায় এবং সংস্কৃতিতে যে দুর্বত্তায়ন চলছে, তারও অসহায় শিকার তারা।

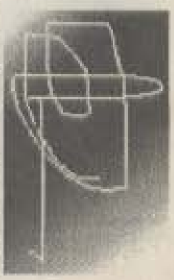

প্রশ্ন: উনবিংশ শতাব্দীতে কোলকাতা বা বাংলার 'নবজাগরণ' বিষয়ে -

আহমদ ছফা: হ্যাঁ, উনবিংশ শতাব্দীর কোলকাতা আমাদের অনেক কিছু দিয়েছে। তার রেজাল্ট আমরা সবাই কম বেশি ভোগ করছি। বাংলা ভাষার বিকাশ হয়েছে, আধুনিক সাহিত্য, আধুনিক সংস্কৃতি, আধুনিক বিজ্ঞান, আধুনিক রাষ্ট্রচিন্তা এসব আমরা পেয়েছি উনবিংশ শতাব্দীর কোলকাতা থেকে। তবে একে রেনেসাঁস বলা ঠিক নয়। তবে এর মধ্যে রেনেসাঁসের অঙ্কুর ছিল। পরবর্তীকালে যা হয়েছে, তা হল রিভাইভিলিজম। বঙ্কিম, ভূদেব থেকে এমনকি রামমোহন রায়ও হিন্দু রিভাইভিলিজম থেকে মুক্ত নন। আমি জানি না পশ্চিম বাংলার বিদগ্ধ সমাজ আমার কথাগুলো কিভাবে নেবেন। আমি মুসলিম সমাজের দিকে তাকিয়েই কথাগুলো বলছি। যেমন বিদ্যাসাগর তার জীবনের অধিকাংশ সময় ব্যয় করেছেন বিধবা বিবাহ সমাজ সংস্কারমূলক আন্দোলনে। সাহিত্যের কাজে সময় দিয়েছে অত্যন্ত কম। একথা রামমোহন এবং তার সহমরণ নিবারণ সম্পর্কেও। এসব মুসলমান সমাজের সমস্যা ছিল না। শুধু মুসলিম সমাজ নয়, নিম্নবর্ণের হিন্দুদেরও সমস্যা ছিল না। এটাকে কেউ সখ করে জাগরণ বললে বলতে পারেন। কিন্তু এটা ছিল অত্যন্ত স্মল গ্রুপের জাগরণ। তার বাইরে এর কোনও প্রভাব ছিল না এবং জাগরণ তারা এমনভাবে ঘটিয়েছিলেন যাতে অন্যরা অবহেলিত এবং লাঞ্ছিত থাকেন।

প্রশ্ন: উনবিংশ শতাব্দীর বিতর্কিত চরিত্র বঙ্কিম, তার সাহিত্য প্রতিভা এবং রাষ্ট্রচিন্তা সম্পর্কে -

আহমদ ছফা: বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে বাংলার মুসলমান লেখকরা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেছেন। বঙ্কিমকে সমর্থন করেন এমন লোক বাংলাদেশে অল্প নয়। কিন্তু তারা সাহিত্যিক বঙ্কিমকে দেখেন। আমি বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে যে বইটি (শতবর্ষের ফেরারী) লিখেছি তাতে নতুন কথা কিছু লিখি নি। সুশোভন সরকারের ছেলে সুমিত সরকার ইংরেজি ভাষায় বঙ্কিম ও হিন্দুত্ব বিষয়ে দীর্ঘ প্রবন্ধের বই লিখেছেন। লেখক হিশেবে বঙ্কিম নবযুগের উদগাতা। তিনি মানবিক এবং সেকুলার চিন্তার ধারক–বাহক। কিন্তু বঙ্কিম যখন রাষ্ট্রচিন্তা করেন, তিনি হিন্দুদের রাষ্ট্র চান। গিরিলাল জৈন্য ফেনামেনন বলে একটি বই লিখেছেন। এই বইটিকে বিজেপির বাইবেল বলা হয়। এই বইটিতে তিনি বঙ্কিমকে কিভাবে দেখেছেন। আজকে বিজেপির কোনও ফোরাম থেকে রবীন্দ্রনাথের নাম পর্যন্ত উচ্চারিত হয় না, রবীন্দ্রনাথ তাদের কোনও কাজে আসবে না। স্বয়ং নীরদ চৌধুরী বলছেন, রবীন্দ্রনাথ খ্রিস্টান চিন্তা চেতনা প্রচার করেছেন। আমি বুঝতে পারি না, পশ্চিম বাংলার লোক বঙ্কিমের প্রতি অন্ধ অনুরাগ কেন রাখবেন। তারা তো অনেক বেশি মুক্ত চিন্তা করতে অভ্যস্ত। কিন্তু বঙ্কিমের প্রশ্নে তারা ঢোক গেলেন কেন?

প্রশ্ন: পশ্চিম বাংলার সাহিত্য চর্চায় আপনি কি সাম্প্রদায়িকতার কোন আভাস পান?

আহমদ ছফা: না, এ বিষয়ে আমি কিছু বলব না।

প্রশ্ন: বিদ্বেষহীন সুস্থ সম্পর্কের জন্যেই প্রয়োজন খোলামেলা মত প্রকাশ -

আহমদ ছফা: এটা অবশ্য ভাবার বিষয়। হ্যাঁ, কিছু পাইতো বটেই। যেমন পশ্চিম বাংলার এক জনপ্রিয় সাহিত্যিক যিনি বাংলাদেশেও জনপ্রিয় তার একটি উপন্যাসে লিখেছেন, মুসলমানরা কোরআন পড়েন উর্দু ভাষায়।

প্রশ্ন: কেউ যদি সত্যজিৎ রায়ের ফেলুদা সিরিজের জটায়ুর মত লেখেন যে উট তার পাকস্থলিতে জল বোঝাই করে মরুভূমির পথে হেঁটে চলেছে, এটা অজ্ঞতা ছাড়া আর কি? এক্ষেত্রেও সাম্প্রদায়িকতা নয়, অজ্ঞতা বলাই কি যুক্তিসঙ্গত নয়?

আহমদ ছফা: হ্যাঁ, তা বলতে পারেন। কিন্তু এত অজ্ঞ হওয়ার তো কথা নয়। আর এত অজ্ঞ হলে উপন্যাস লিখতে এসেছো কেন? এমন–কী 'প্রেম নেই' বলে যে উপন্যাসটার তারিফ করা হয়, তাও লেখা হয়েছে মুসলিম লীগের স্ট্যান্ডটাকে

> পশ্চিম বাংলায় গলির মোড়ে মোড়ে বিদগ্ধ লোক পাওয়া যায়। দেশ পত্রিকাতে যে সমস্ত পাঠক চিঠি লেখেন, চিঠিগুলো যেভাবে গুছিয়ে লেখেন, তা পৃথিবীর খুব কম দেশেই লেখেন।